উপন্যাস সঙ্কলন

দ্বিতীয় খণ্ড

নজমূল হক চৌধুরী

সম্প্রীতি প্রকাশ

সূচিক্রম

প্রেমিক বদল ♦ ৭
অবিবাহিতা ♦ ৫৭
কলঙ্কিনী ♦ ৯৩
কাবেরীর প্রেমমালা ♦ ১৩০
চরিত্রহীন ♦ ১৭৯

প্রেমিক বদল

এক

সুভদ্রা তরুণী যেখানে বসেছেন, বিদায়ী হেমন্তের শেষ সোহাগ হিসেবে ডালের অবশিষ্ট কামিনীফুল কয়েকটি বাতাসের হিল্লোলে দুলে দুলে গন্ধ ছড়াচ্ছে। যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, গন্ধ পসারিণী হিসেবে তাদের কাজ সারা। গন্ধে বারান্দার পরিবেশটা মনোমুগ্ধকর ভেবেই তরুণী এখানে বসেছেন। গন্ধ মিঠেল হাওয়ায়, চারদিকের ঝলমল রোদের পরিচ্ছন্নতায় এবং নতুন জীবনের আনন্দময় আমেজটাতে আসন্ন শীতের ছোঁয়াটা কিছুটা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে বটে। তাই হয়তো তরুণী নিমগ্ন ভাবাবেশে একটি রোম্যান্টিক উপন্যাস পড়েই যাচ্ছেন। যাকে বলে ডুবে থাকা।

কাজের মেয়ে রেশমা চায়ের কাপ হাতে দাঁড়াল, সুভদ্রার পাশে। সে সাড়া জাগিয়ে নম্র স্বরে বলল, "বড় আপা, চা নিন।"

সুভদ্রা গাম্ভীর্য দেখাবার ইচ্ছায় রেশমার সাড়ার প্রতি বধিরতা দেখিয়ে চুপচাপ বইটি পড়ে যাচ্ছেন। রেশমাও শঙ্কিতার মত দাঁড়িয়েই রইল। কারণ এই সুভদ্রা অত্যন্ত সেন্‌সিটিভ, ছিঁচ মেজাজী এবং ন্যায় শাসনশালিনী। কারো চালচলনের ধারা একটু অসঙ্গতিপূর্ণ হলেই তিনি তার দোষ ধরে শিষ্টাচার শিখিয়ে ছাড়েন। গুণ আহরণের হিতোপদেশ দেন। সুভদ্রা প্রায় দুই মিনিট পর সম্মুখের দালানের দ্বিতীয় তলার বারান্দার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে একটি মিষ্টি হাসি দিলেন। রেশমা চায়ের কাপটি এগিয়ে ধরল।

সুভদ্রা চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে ঠোঁট দুটি ভরে একটি চুমুক দিয়ে বললেন, "হাঁ এখনকারটা সেরেছে। যাও, নাশতা তাড়াতাড়ি কর। কলেজ আছে। বুঝলে?"

সুভাদ্রার নাম গীতিকা। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে গত বছর এম. এ. সেকেণ্ড ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছেন। তিনি ডিগ্রী নিয়ে অকর্মণ্যের মত ঘরে বসে থাকাটা অবিবেচক, অলস ও বুদ্ধিহীনার কাজ ভেবে মতিঝিল আইডিয়াল কলেজে বাংলা প্রভাষিকার পদে চাকুরী গ্রহণ করলেন।

অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে নয়, একটি সংস্কৃত পরিবেশে সময় কাটানোর এবং অর্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তিনি চাকুরী নিলেন।

দুইটি দালানের গেইট দুইটি হলেও পরিবেশ একটি, সীমানা একটি এবং চলাফেরা অবিভাজ্য। দুটি দালানের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান মাত্র দশ গজ।

গীতিকার দালানের পাদদেশে লাগানো কাঁটালতা দ্বিতীয় তলার গ্রীল পর্যন্ত পৌঁছে একটি বেষ্টনীর সৃষ্টি করেছে। তিনি যেখানে বসেছেন, অপর দালানের দোতলা হতে বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালে তিনি তীর্যক দৃষ্টিতে নজরে পড়েন। যেহেতু উভয় দালানের বারান্দা একমুখী নয়।

অপর দালানের দ্বিতীয় তলার বারান্দার শেষ প্রান্তে প্রফেসর সাহেব দাঁড়ানো। দাঁত ব্রাশ করছেন তিনি। ইত্যোবসরে গীতিকার সাথে হাসিভরা মুখে বার কয়েক চোখাচোখি হয়েছে, এই যা! আকর্ষণ এখনো অন্তর ধরে টানাটানি শুরু করেনি।

নারীর রূপই শুধু পুরুষকে পাগল করে না। পুরুষের রূপও নারীকে উন্মনা করে। প্রফেসর সাহেবের রূপ দেখে গীতিকার মহাকবি নজরুলের গজল গীতির তালে তালে তবলা বাজানোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার ইচ্ছা জাগতে লাগল যেন। কারণ, এমন সুঠাম রূপবান পুরুষের সোহাগিনী সেজে অনুগামিনী হয়ে পা ফেলে চলতে শুধু নজরুল-সঙ্গীতের সুর ও ছন্দের প্রয়োজন। অন্যথায় পথগামী হিসেবে তাকে মানাবে না।

প্রফেসর সাহেবের প্রকৃত নাম কাজী নুরুল আলম। তিনি ঢাকায় কোন কাজে এলে গীতিকার প্রতিবেশীর বাসায় ওঠেন। এটা তাঁর ফুফুর বাসা। সুতরাং এখানে থাকতে, বেড়াতে, চলতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না। ফুফু তাঁকে প্রফেসর বাবা, ফুফাত ভাই-বোনেরা প্রফেসর ভাইয়া এবং কাজের মেয়ে প্রফেসর সাহেব সম্বোধন করে ডাকাডাকি করেন। এটা গীতিকার পরিবেশ থেকে বুঝে নিতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

গীতিকা মনে মনে এই বলে মন্তব্য করেন যে, রূপসৌন্দর্য, গঠনসৌষ্ঠব এবং ভদ্রতার দিক দিয়ে যদি বাংলাদেশে কোন পুরুষকে প্রফেসর হিসেবে মানিয়েছে, তা হলে তিনি এই কাজী নুরুল আলম। একটা সুদর্শন পুরুষ বটে। খোদার নিজ হাতে গড়া।

প্রফেসর সাহেব আরও একমাস পূর্বে এ বাসায় এসেছিলেন। বাসাটির নাম সালমা মঞ্জিল। সেদিন গীতিকা কোন এক দরকারে সালমা মঞ্জিলে গিয়েছিলেন। দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে সিঁড়ির মাঝখানটাতে দুজনের গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকিই হয়ে গিয়েছিল। গীতিকার মনে সেদিন কেন যে রাগ, ঘৃণা, শ্লেষ কিছুরই সৃষ্টি হয়নি। শুধু প্রকট ভাবাবেগের আবেশে একটু লজ্জাবোধ হচ্ছিল। প্রফেসর সাহেবও ছটপট শুধু বলেছিলেন, "I am sorry, Madam, Don't think it for anything."

গীতিকা হরিণী লাফে সেখান থেকে চলে এসে চোখমুখের লজ্জা লুকালেও প্রাণের শাখায় সুখের হাওয়া সারাটি দিন বইছিল। তিনি সারাদিন বারান্দায় আসা-যাওয়া করেছিলেন। কারণ আত্মার শাসন ও বাসনার মধুরতার মধ্যে একটি সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল।

প্রফেসর সাহেবের দাঁত ব্রাশ করা শেষ হওয়া সত্ত্বেও কি এক লালসায় পড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরও চাউনী চারদিকে ঠিকরে পড়া গোছের। তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সেখান থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

রেশমা এসে নোটিশ জারি করে বলল, "বড় আপা, আটটা বাজল। নাশতা টেবিলে দেব?"

"কি বলিস? আটটা বেজেই গেছে?" গীতিকা হাতঘড়িতে সময় দেখে অবাক। তিনি বইটি বন্ধ করে দ্রুত উঠে গেলেন। এবার তাঁকে দারুন ব্যস্ততাই পেল। গোসল করা, নাশতা খাওয়া, পোশাক পরা কত ঝামেলাই বাকি। অথচ তাঁর প্রথম ক্লাশ দশটায়। তিনি উঠে যাবার সময় শুধু ডানহাতে আসর ভঙ্গের একটি বিদায়ী টাটা জানালেন।

গীতিকা প্রায় সপ্তাহ যাবৎ নিজেই কার ড্রাইভ করে কলেজে যান ড্রাইভারের অভাবে। একজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে নিয়োগ দেওয়ার আলোচনা চলছে।

গীতিকা শাড়ি পরেই নিয়মিত কলেজে যান। তিনি পোশাক পরে কার বের করে কলেজে রওয়ানা হবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলেন। প্রফেসর সাহেব বারান্দায় দাঁড়ানো। কিযে ভাল লাগল তাঁর। গর্ব বোধ হল গীতিকার। প্রফেসর সাহেব বারান্দায় শুধু চাওয়ার নেশায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বাসন্তীরাঙা শাড়ি ও ব্লাউজের রঙের সাথে দেহের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের কান্তিচ্ছটা একরঙা হয়েছে যেন। গীতিকা দুই-তিনবার তীর্যক দৃষ্টিতে প্রফেসর সাহেবের দিকে তাকিয়ে নিলেন ঘন ঘন। তিনি চাওয়ার নেশায় যেন বলতে চাচ্ছেন– এই আমি, প্রকৃত গীতিকা। মতিঝিল আইডিয়েল কলেজের একজন অধ্যাপিকা। গীতিকা কারে স্টার্ট দিয়ে রওয়ানা হলেন মতিঝিল অভিমুখে। প্রফেসর সাহেব হাত উঠিয়ে টাটা দিলেন।

দুই

প্রফেসর সাহেবের প্রেমে পড়ার আগ্রহটা গীতিকার, প্রফেসর সাহেবের নিজের যতটা নয়। তাঁকে পছন্দ করে ফেলার পর তিনি নিজেই প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করতে লাগলেন প্রফেসর সাহেবকে কাছে টানতে। কিন্তু প্রফেসর সাহেব যেন দ্বিধান্বিত। জটিল চিন্তায় পড়লেন তিনি। এত সহজে পাশ ঘেষবেন কিনা, বা ধরা দেওয়া ঠিক হবে কিনা। তাছাড়া এটা তো আর স্থায়ী আবাস নয় যে গীতিকার সাথে প্রেম করে প্রেমের স্থায়ীত্ব রক্ষা করা সম্ভব। তিনি যতই পিছু টান দেন গীতিকা ততই এটাকে প্রফেসর সাহেবের চরিত্রের দৃঢ়তা বলে ধরে নেন। গীতিকা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, দ্রুত চান প্রফেসর সাহেবের চরিত্রে গলন সৃষ্টি করতে। বুঝিয়ে দিতে চান যে তিনি তাঁর পছন্দের। তাঁর হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত। সেই দ্বারে পৌঁছতে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। দ্বিধান্বিত হবার কোন যুক্তিই নেই।

গীতিকা আজ আন্তরিকভাবে চাচ্ছেন প্রফেসর সাহেব এবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পূর্বে তাঁর সাথে নির্জন স্থানে দেখা করতে, দুটি কথা বলতে এবং গল্পচ্ছলে হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা বুঝিয়ে দিতে।

নারী যাকে পছন্দ করে বসে, জীবন ও যৌবনের সমস্ত সঞ্চয় যাকে সমর্পণ করতে চায় এবং ঘর বেঁধে মা হবার স্বপ্ন দেখে তাকে চায় সে অন্তরের পুষ্পশয্যায় বসিয়ে একান্তই আপনার করে। তাঁর পছন্দে অন্য কারো পছন্দের বা অপছন্দের ভাগ সে মানে না। তার জন্য সে চিরতরে একতরফা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই সে পারে এক পুরুষের প্রেমসোহাগে বুকের পিপাসা মিটাতে। হতে পারে সে নিষ্কাষিত, হতে পারে মায়াবিনী, স্নেহবর্ষিণী মানসী ও মা। জগতের সমস্ত রম্যতা কোলাহল মাত্র। শুধু আপন পুরুষের গুণগানই তার কাছে মহাপ্রভুর বিশাল সৃষ্টির মহিমা, গরিমা ও বিভূতি। আর এজন্যই তাকে মাতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিতা করা হয়েছে। নইলে গোটা মানবজাতি জারজকুলে পরিণত হত।

কলেজ থেকে এসে গীতিকা অপরাহ্নে অসমাপ্ত উপন্যাসটি নিয়ে বসলেন বারান্দায়। সকালে যেখানে চেয়ারে বসে সেটা পড়েছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ একমনে বইটি পড়ে তাকিয়ে দেখে অনুসন্ধান সমাপ্ত করলেন তিনি, প্রফেসর সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কিনা। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গীতিকার সন্দেহ হল, হয়তো প্রফেসর সাহেব চলে গেছেন। তাহলে কি তিনি গীতিকার মনের ভাব বুঝতে পারেননি? তাঁর বিশ্বাস হয়না, যে পুরুষের চোখে তাঁর হরিণী আঁখির বাঁকা দৃষ্টি পড়েছে, তিনি এত সহজে পালাবেন।

গীতিকা এবার সাড়া জাগিয়ে প্রফেসর সাহেবের অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহ দূর করতে চাইলেন। যেন সালমা মঞ্জিলের অপর প্রান্ত থেকে শোনা যায় এমন কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করে ডাকতে লাগলেন, "এ্যয় রেশমা, রেশমা।"

রেশমা স্বর চিকন করে উত্তর দিল, "আসি বড় আপা।"

"এক কাপ চা দিয়ে যা তাড়াতাড়ি।"

প্রফেসর সাহেবের যেন ঘণ্টা বাজল! ক্লাস শুরু হবে এখন। কিন্তু এ ক্লাস তো কলেজের নয়, প্রোমোদ্যানের। তিনি হাফ শার্টটি গায়ে এঁটে এসে দাঁড়ালেন গীতিকার ক্লাসে। ক্লাস শুরু হল বারান্দায়। প্রফেসর সাহেব এক বারান্দায়, ছাত্রী অন্য বারান্দায়। পাঠদান চলবে চোখ-ইশারায়।

রেশমা এসে চা দিয়ে গেল।

গীতিকা লম্বা টানে এক চুমুক চা পান করে ডানহাত উঠিয়ে প্রফেসর সাহেবের দিকে কাপটি প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, "চা চলবে? তবে আসুন, বা কোন হোটেলে চলুন। আড্ডা দিই।"

প্রফেসর সাহেবের প্রাণের শাখায় হঠাৎ দক্ষিণা হাওয়ার একটি ছন্দহিল্লোলের সৃষ্টি হল। মুখ খুলে নিয়ে দাঁত দুইপাটি বের করে নিঃশব্দ একটি হাসি দিলেন। তিনি এবার শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে গীতিকার দিকে মুখ করে উভয় হাতের আঙুলগুলি ফড়কিয়ে কি যেন বুঝাতে চাইলেন। কিন্তু গীতিকা এত সহজে বুঝতে পারলেন না।

গীতিকা চা-কাপ পান শেষ করে গ্রীল ধরে দাঁড়ালেন। মুখের হাসিতে তাঁর সাহচর্য লাভের ব্যগ্রতা। তিনি প্রফেসর সাহেবের করা ইশারার অর্থ বুঝতে চান।

প্রফেসর সাহেব দোতলার বারান্দায় যেখানে দাঁড়িয়েছেন, একটি পেয়ারা গাছের বর্ধনশীল শাখা সেখান পর্যন্ত পৌঁছেছে। ডালে কয়েকটি আধাপাকা পেয়ারা। তিনি একটি পেয়ারা ছিঁড়ে নিয়ে গীতিকার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারার জন্য প্রস্তুত হলেন। যেন ক্রিকেট খেলার ব্যাটিং শুরু হল।

প্রফেসর সাহেব পেয়ারাটি ছুঁড়ে মারলেন। সেটা ঠাস করে এসে দেয়ালে আঘাত করে গীতিকার পায়ের কাছে ঘুরপাক খেতে লাগল। গীতিকা পেয়ারাটি উঠিয়ে নিয়ে আঁচলে মুছে কামড় বসিয়ে চিবুতে লাগলেন। এবার ইশারায় তিনি প্রফেসর সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর ইশারার অর্থ তিনি বোঝেননি।

প্রফেসর সাহেব বুঝিয়ে দিলেন যে, বেলা পড়ে এল। বাইরে যাবেন তিনি। যদি গীতিকা রাজি থাকেন, তাহলে উভয়ে কোন নিরিবিলি পরিবেশে গিয়ে গল্প করে এবং ঘুরে-ফিরে সময় কাটাতে পারলে ক্ষতি কি?

এ ইঙ্গিতময় প্রস্তাবে গীতিকার অঙ্গে অঙ্গে যেন সঙ্গীতানন্দের শিহরণ শুরু হল। তিনি নীরব ইশারায় সম্মতি দিয়ে রমনা পার্কে যাবার প্রস্তাব করলেন।

প্রফেসর সাহেব খশীতে উল্লসিত। গীতিকা সাজগোজ করে বের হলেন এবং আসার ইঙ্গিত করলেন। তিনিও পোশাক পরে আসার ভঙ্গিমা দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

গীতিকা নাচুনীপ্রায়। কক্ষের ভিতরে ঢুকে গুনগুনিয়ে সুর টানছেন এবং সবচেয়ে দামী ও পছন্দের শাড়িটা পরছেন।

রেশমা দুরন্ত চালাক। সে গীতিকার প্রফেসর সাহেবের সাথে করা সব রকমের ইশারা-ইঙ্গিত লুকিয়ে চেয়ে নিয়ে বেশ আমোদিত। সে মুখে চোরাহাসি নিয়ে গীতিকার কক্ষে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

গীতিকা ড্রেসিং আয়নায় রেশমার আগমনকে লক্ষ্য করে বললেন, "কিরে রেশমা, কিছু বলবি?"

"আপনি কোথাও বের হচ্ছেন বুঝি?"

"হাঁ, আমি একজন বান্ধবীর বাসায় যাব। বহুদিন পর তার সাথে আজ দেখা হয়েছিল। এখন বিকেলে তার সাথে ক্ষণিক বেড়ানোর ওয়াদা আছে। তাই বের হচ্ছি। তুই কি বলবি বল।"

"আপনি যে একজন কার-ড্রাইভার চান, একজন লোক এসেছে। সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়। সে নাকি খুব ভাল ড্রাইভারি জানে। নীচের তলায় গেইটে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ডাকব।"

"দেখিস না, আমি এখন বেড়াতে বের হচ্ছি। এখন কথা বলার সময় নয়। লোকটাকে আগামীকাল সকাল আটটায় আসতে বল। যা এখন।"

রেশমা ব্যস্তভাবে সিঁড়ি বেয়ে নামল নীচের তলায়। লোকটি বিনীতের মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে করুণাভিক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা।

রেশমা বলল, "ভাই, আপনি কাল আসবেন সকাল আটটায়। ম্যাডাম এখন বেড়াতে যাবেন। কথা বলতে পারবেন না।"

লোকটি– আচ্ছা ঠিক আছে। আমি কাল আটটায় আসব। এই বলে সে চলে গেল। অন্তরে তার চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনার সুখ। চোখে-মুখে তার কৃতজ্ঞতার ছাপ।

রেশমা সিঁড়ি বেয়ে উঠল দোতলায়। অমনি ডাক পড়ল– রেশমা।

"জী আসি।" রেশমা দৌড়ে গিয়ে ঢুকল গীতিকার কক্ষে।

"আমার কাপড়গুলি এই যে খুলে রাখলাম। তাড়াতাড়ি এগুলি আলনায় গুছিয়ে রাখ। ড্রাইভার লোকটি কি বলল?"

"কাল আসতে বলেছি সকালে।"

"আসবে তো কাল?"

"আসবে বলে বলেছে। এখন চলে গেল।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বেড়াতে গেলাম।" গীতিকা কথা বলেন আর উড়িয়ে-এলিয়ে-পড়া শাড়ির আঁচল বামহাতে বুকে টানতে টানতে পা ফেলে কক্ষ থেকে বের হয়ে দাঁড়ালেন বারান্দায়। তিনি দৃষ্টিপাত করে অনুসন্ধান করতে লাগলেন, প্রফেসর সাহেব প্রস্তুত হয়েছেন কিনা। নাকি তিনি এতক্ষণে বের হয়ে গেইটে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রফেসর সাহেব সজ্জিত হয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। গীতিকা আঙুলের নির্দেশে তাঁকে মেইন রোডের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়।

প্রফেসর সাহেব দোতলা থেকে নেমে গেইট পার হয়ে মেইন রোডের দিকে হাঁটতে লাগলেন। গীতিকাও নেমে পড়লেন দোতলা হতে। তিনি প্রফেসর সাহেবের পদক্ষেপের তালে তালে চারুছন্দে পা ফেলতে লাগলেন এমন ব্যবধান তৈরি করে যেন প্রেসক্লাবের মোড় না পাওয়া পর্যন্ত দূরত্ব মিলিয়ে না যায়। গীতিকা আঁচলে, বক্ষপুঞ্জে এবং খোঁপার গ্রন্থিতে যে পরিমাণ সেন্ট মেরেছেন, তা যদি কোন শিল্প এলাকায় ছিটানো হত, তবে তার সুগন্ধে ঐ এলাকার পুরো এক বছরের বায়ুদূষণ মিটে গিয়ে পরিস্রুত হত।

জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষের সাথে মিলন-বিহার। হৃদয় সরসীতে স্বপ্নপুরুষের গন্ধকমল আবেগের তরঙ্গে দুলছে। চরণ যত চলছে না, মাংসল কোমর দুলছে ততোধিক।

পৃথিবীতে বাস করে স্বর্গসুখ গ্রহণ করার নানা অবলম্বন থাকতে পারে। তার মধ্যে বোধ হয় প্রেমপ্রীতির সুখস্বাদই সর্বাপেক্ষা মধুর। কিন্তু জীবন-যৌবনের মাঝখানে একটা অবিশ্বাস্য জগৎ আছে, যেখানে অবিবেচক প্রেমিক ও প্রেমিকার আকাশকুসুমের আবাদ হয়ে থাকে। অনেকে প্রেম করে বেশী কিছু পেতে চান, অমরত্ব লাভ করতে চান এবং কিছু একটা হতে চান। কিছু পাওয়ার আশায় শেষটায় সামান্য কিছু না পাওয়াটাই বাস্তব।

প্রেসক্লাবের মোড়েই গীতিকা প্রফেসর সাহেবের সাথ ধরলেন। গীতিকাকে নাগাল দেওয়ার জন্য প্রফেসর সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুজন এমন ব্যবধান ও সান্নিধ্য তৈরি করে পা ফেলে ফেলে হাসিভরা মুখে আলাপ করতে করতে হাঁটতে লাগলেন যে চতুর্দিক হতে আসা লোকচক্ষুর প্রতিফলনে সব রহস্য একটি শোভনীয় দম্পতির শুদ্ধ বিশ্বাসে বিম্বিত হতে লাগল। তাঁরা বিবাহবন্ধনের শর্তে বাঁধা যুগল– এমনটি শহরবাসীরা এ মুহূর্তে বিশ্বাস করবে না কেন?

গীতিকা মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "বেড়াতে তো এলাম। কোথায় গিয়ে বসলে ভাল হয়?"

প্রফেসর সাহেব বললেন, "আপনি সম্মতি দিলে ন্যাশনাল গার্ডেনে গিয়ে বসি। সেখানে নিরিবিলি টক করা যাবে।"

গীতিকা একটু বিস্মিত হলেন। ন্যাশনাল গার্ডেন– সে বুঝি কোথায়, কত সুন্দর ও কতদূর! তিনি রহস্যটা ভেঙে নেওয়ার জন্য বললেন, "ন্যাশনাল গার্ডেনে যাবেন মানে?"

প্রফেসর সাহেব হেসে বললেন, "কেন রমনাপার্ক চেনেন না? এর চেয়ে বিগ গার্ডেন কি বাংলাদেশে আর আছে? এটাই তো ন্যাশনাল গার্ডেন। জানেন না?"

গীতিকা এতক্ষণ অন্য বিরাট কিছুকে ভেবেছিলেন। কিন্তু বিরাট ও অসম্ভব রকমের বস্তুটি নিকটবর্তী ও অতিপরিচিত একটি স্থানকে নির্দেশ করায় গীতিকা হতভম্ব হলেন। আপন জ্ঞানের ক্ষুদ্রতাকে ঢেকে ফেলে গীতিকা বিরাটকে তুচ্ছ করে বললেন, "নাকি অন্য কোন ভাল স্থানে বসবেন? রমনায় বাজে লোকের যা ভিড়।" তাঁর মতে রমনাপার্ক শুধু ছন্নছাড়া টোকাইদের আড্ডাখানা। তাঁর মত সুভদ্রার জন্য সেটা একটি দুর্গন্ধময় জায়গা বটে!

প্রফেসর সাহেব জানতে চাইলেন, "অন্য কোথায় যাবেন? যেখানে যাবেন, আমি সঙ্গে আছি। কোন আপত্তি নেই?"

গীতিকা এবার সমান্তরাল ভাব প্রকাশ করে বললেন, "আচ্ছা আজ পার্কেই বসি। আবার কখনও সুযোগ এলে অন্য কোথাও বসব।"

প্রফেসর সাহেব তৎক্ষণাৎ রসিকতা করে বললেন, "কেন চান্স কি এটাই প্রথম ও শেষ?"

দুজন হেঁটে যাচ্ছেন দেহের একান্তই নিবিড়তা সৃষ্টি করে। গীতিকার বুকের আঁচল হাওয়ায় উড়ে গিয়ে অনেক সময় প্রফেসর সাহেবের নাকের ডগায় এলিয়ে পড়ে এবং তিনি কুড়িয়ে নেওয়ার মত করে ছুঁড়ে মারেন?

গীতিকা বার কয়েক এরূপ হবার পর আঁচল সামলিয়ে নিয়ে বললেন, "না। তা বলছি না। সুযোগ তো প্রতিদিনই সম্ভব হত। কিন্তু অসুবিধা এই যে, আপনি কিছুটা দূরে পড়ে আছেন। যদি ঢাকায় থাকতেন, প্রতিদিনই আড্ডা দিতে পারতাম। তখন আমি আপনাকে এত সঙ্গ দিতাম যে আপনি বিরক্তই হতেন।" চোখ বাঁকা করে গীতিকা প্রফেসর সাহেবের দিকে চেয়ে মুখ খুলে হাসলেন একবার।

প্রফেসর সাহেব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "দেখুন, আমার ইচ্ছাটা কিন্তু একটু অন্য রকম। আমার ইচ্ছার মাপে আপনি হয়তো ধরা দিতে চাইবেন না।" তিনি দুঃখিত ও অন্যমনস্কের মত উদাসীন।

প্রফেসর সাহেবের ঔদাসীন্যে গীতিকা উদ্‌ভ্রান্তপ্রায়। তিনি ব্যস্তভাবেই জানতে চাইলেন, "কি আপনার ইচ্ছা? আগে বলুন। শুনি আপনার ইচ্ছাটা কি। তারপর বুঝব,

আপনার ইচ্ছা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা।" কথার ভঙ্গিতে গীতিকা বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি অকুণ্ঠিতা। চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা প্রফেসর সাহেবের।

এতক্ষণেই তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে পার্কের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের প্রশ্নোত্তর পর্বে হঠাৎ ছেদ পড়ল। পার্কের ভিতরে প্রবেশ করে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে গীতিকা বললেন, "চলুন, ঐযে কৃষ্ণচুড়া গাছটি, ওর তলে গিয়ে ছায়ায় বসি। জায়গাটা কেমন নিরিবিলি দেখাচ্ছে।" আঙুল উঁচিয়ে নির্দেশ করলেন তিনি কৃষ্ণচূড়া গাছটির দিকে।

বেলা পড়ে আসায় সূর্যতাপের প্রখরতা অনেকটা স্তিমিত। রমনা পার্ক ধীরে ধীরে জনাকীর্ণ হতে লাগল। দুজন মিলে জুটি বেঁধে, তিনচারজন মিলে দলবদ্ধ হয়ে, কেউবা নিঃসঙ্গ নীরবের মত হেঁটে বেড়াচ্ছে, গল্প করছে এবং বসে আড্ডা দিচ্ছে। অপরাহ্নে পার্কে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। আজও এর ব্যত্যয় দেখছি না। ঠাণ্ডাশীতল হাওয়ায় শরীর-মন জুড়ানোর উদ্দেশ্যে এরা এসেছে পার্কে। চারদিক বেশ স্বরগরম ও আমোদিত।

কৃষ্ণচূড়া গাছটির নীচে কোন বৈঠকবেঞ্চ নেই। কিন্তু এর পরিবেশটি সবচেয়ে নিরিবিলি। আর বসার মত জায়গায় কুঞ্জচারীর ভিড়। চারদিকে সমারোহ ও বৈঠকী আনুষ্ঠানিকতা।

গীতিকা হেসে বললেন, "এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন? নাকি অন্য কোথাও স্থান খুঁজে নিয়ে বসে পড়বেন?"

প্রফেসর সাহেব চতুর্দিকে উন্মীমিত দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে বললেন, "বসার জায়গা হয়তো অন্যত্র পাব। কিন্তু এমন নিরিবিলি স্থান আর অবশিষ্ট নেই। কুঞ্জচারীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে তো বসাও যাবে না।"

গীতিকা সময় ব্যয় করতে রাজি নন। তিনি জানতে চেয়ে বললেন, "কই বললেন নাতো আপনার সেই বিশেষ ইচ্ছেটা কি।"

প্রফেসর সাহেব উপলব্ধি করলেন, গীতিকা তাঁর প্রতি সত্যিই আকর্ষিত, মুক্তকণ্ঠী এবং নিজেকে তুলে ধরতে পূর্ণরূপে আগ্রহী। তিনি একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, "সত্য কথা বললে হয়তো রাগ করবেন। নাকি আমাকে নোংরা এবং দুষ্ট ভেবে বসেন, জানি না।"

গীতিকা এবার মুখ বেজার করে বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। যদি মনে করেন যে, আপনাকে আমি নোংরা ভাবি, তাহলে আপনার ইচ্ছার কথাও শুনতে চাই না।" গীতিকার ব্যবহারে অভিমান এবং খসে পড়ার ভাব।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। গীতিকার মুখমণ্ডলে অভিমানের প্রচ্ছায়া। আর প্রফেসর সাহেবের মুখোচ্ছায়ায় অজস্র কথাকে সহস্র সূত্রে গেঁথে নিয়ে উপস্থাপন করার চিন্তাশীল প্রস্তুতি।

মিথ্যা সত্যের চেয়ে অনেক বেশী বিন্যস্ত হয়ে থাকে। তাইতো তার দাপট এত বেশী। তাই বহুক্ষেত্রে সত্যই মিথ্যার হাতে চাবুকপেটা হয়ে গড়গড় শব্দে নিশ্বাস নিয়ে মানুষকে হাসায়, মিথ্যাই তখন বিচারকের পদ গ্রহণ করে। কিন্তু একটি সত্যের লাথির ভার সহ্য করার মত শক্তি হিমালয়তুল্য মিথ্যার নেই।

প্রফেসর সাহেব দেখলেন, বনের লাজুকী হরিণী ধানক্ষেতের কচি ফসল খাওয়ার আবেগে বনছাড়া হয়েছে এবং প্রলোভনে পড়ে স্বেচ্ছায় লোকালয়ে এসেছে। সুতরাং আসতে দেওয়া যাক। প্রথম আসায় জালবন্দী করা ভুল হবে। তবে বন্দী হওয়ার মত

আগ্রহের সৃষ্টি করিয়ে নিতে হবে। বন্দী হবার দুর্দশার কথা যেন ঘূর্ণাক্ষরেও টের না পায়। আগে মুক্ত মনে বিচরণ করুক। তীরবিদ্ধ হবার সময়কে বিলম্বিত করাই উত্তম।

প্রফেসর সাহেব মান ভাঙানোর উদ্দেশ্যে বললেন, "রাজি থাকলে একটা কথা বলি। শুনবেন? না রাগ করবেন?"

গীতিকা বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "যা বলার, বলুন তো। এত ইতস্তত করছেন কেন? একটা কেন, হাজারটা বলতে পারেন। আপনি কি মনে করেন যে, আমি রগচটা মেয়ে। নাকি আমাকে মেজাজী ভাবেন?"

এতগুলি প্রশ্ন! কতটার উত্তর দেবেন প্রফেসর সাহেব? তিনি এবার নির্দ্বিধায় বললেন, "আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে ঢাকা আসব। শুধু আপনার সাথে এখানে সঙ্গসুখ পাবার জন্য। এছাড়া অন্যদিন সম্ভব হবে না। বোঝেন তো চাকুরী করি। সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার ঢাকায় থেকে শুক্রবারও আপনার সঙ্গসুখ নিয়ে বিকেলে চলে যাব বাড়িতে।"

কিছু কিছু কথা আছে, সবার মুখে শুনতে ভাল লাগে না। বিশেষ কারো মুখে শুনতে মন চায়। একথাগুলি আপন জনের মুখে মানায়। অন্যের মুখে অভদ্রজনের অশ্লীল ভাষার গালির মত লাগে।

গীতিকা হেঁট মাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন, শরীরে যেন লজ্জার একটি চাদর জড়ায়ে নিয়ে। অনাগ্রহ দেখিয়ে কিন্তু একান্ত আগ্রহের সাথে কথাগুলি শুনলেন তিনি। ঝিলিকহানা একটি হাসি হেসে বললেন, "আপনি যে ঢাকায় আসবেন, তা কিভাবে বুঝব? ঢাকায় এলে কি সালমা মঞ্জিলে উঠবেন? নাকি অন্য মাধ্যমে আপনার আগমন সম্পর্কে জানতে পারব?"

প্রফেসর সাহেব যুক্তি দেখিয়ে বললেন, "আমি সালমা মঞ্জিলে যাঁর কাছে আসি, তিনি আমার আপন ফুফু। আপনি নিশ্চয় বুঝবেন, অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া মানে তাকে উত্যক্ত করা এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে খাটো করা। আপনার আকর্ষণে আমি আসব। কিন্তু তাঁরা যেন এটা ঘূর্ণাক্ষরেও টের না পান। তা নাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না। এমনিতে সালমা ফুফু তাঁর মেঝ মেয়ে সাদিয়ার জন্য আমার কাছে একদিন প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি না করায় তিনি আমার উপর বেশ মনক্ষুণ্ন স্বভাবের। এর পরও তাঁর কাছে আসি শুধু আত্মীয়তার টানে। এখন থেকে বুঝবেন যে, আমি শুধু আপনার টানেই আসি।" প্রফেসর সাহেব যেন বেদনাতুরের মত বলার আবেগ শেষ না হতেই থামলেন। তিনি এদিক-ওদিকে তাকাতে লাগলেন।

প্রফেসর সাহেব লোকটি এত সুঠাম এবং হলুদবর্ণ চারুশিল্পের ধাঁচে সুন্দর গড়নের যে, প্রফেসর হিসেবে তাঁর চেহারা শুধু মানানসই নয়, অধিকতর পছন্দের উপরে। বয়স তাঁর পঁয়ত্রিশ হবে। কিন্তু ললনাশোভন গঠন ও সৌন্দর্যের জন্য বয়স ততটা বোধ হয় না। ত্রিশ বছর বয়সের নাদুস-নুদুস একজন অবিবাহিত যুবক বলে মনে হয়। তিনি গীতিকার সমানবিদ্যায় বিদ্বান এবং কলেজের একজন শিক্ষক, এই বিবেচনায় শুধু নয়, তাঁর সৌম্যতা এবং ভদ্র বেশভূষাই গীতিকার কাছে অধিক আকর্ষণের। গীতিকার ধারণা, প্রফেসর সাহেব উচ্চবংশীয় ধনাঢ্য পিতার সন্তান। একটি ভদ্র ঘরের ছেলে। গীতিকার মতে এঁর মত সুন্দর পুরুষ বাংলাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গীতিকার পায়ে ঝিনঝিনি ধরল। তিনি প্রফেসর সাহেবকে সোহাগিনীর মত রাজি করিয়ে বললেন, "চলুন, হেঁটে হেঁটেই আলাপ করব। দাঁড়িয়ে থেকে আর ভাল লাগছে না।"

একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এবং কথা কইতে কইতে হাঁটছেন। মাঝে মাঝে উভয়ের দেহের ব্যবধান এতই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে যে, ঘষাঘষি এবং ঠোকাঠুকিও হয়ে যায়। তখন দুজনে ঠোঁট কামড়িয়ে চাপা হাসি হেসে ওঠেন।

"আগামী বৃহস্পতিবার তাহলে কি আসবেন ঢাকায়? আসাটা কি নিশ্চিত।" গীতিকা আমন্ত্রণ জানানোর ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ভাষায় যেন কত ফাগুনের গানের পাখিদের সুর ঝরে পড়ল। কিযে মায়া সে সুরে ও ভাষায়!

প্রফেসর সাহেব হেসে উত্তর দিলেন, "আপনি কি চান যে আমি আসি?" অনুমতি চাওয়ার কি যে ভঙ্গিমা তার!

"হাঁ চাই। না এলে বুঝব, আপনি একটা কপট লোক। আমার টানে নয়, সাদিয়ার টানে ঢাকায় আসেন।" গীতিকা ভাষায় সন্দেহের বিষ ঢেলে দিলেন।

"অল রাইট। আমি অবশ্যই আসব। কিন্তু আমি কোন শর্তেই সালমা মঞ্জিলে উঠতে পারব না। সোজা চলে আসব এখানে। আপনি বিকেল ঠিক চারটায় এখানে এসে উপস্থিত হবেন। যেন আমাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বসে থাকতে না হয়। আমি সোজা চান্দিনা হতে চলে আসব এখানে। কলেজ ছুটির পর।"

গীতিকা এবার পুরো মাত্রায় আহ্লাদিতা। তিনি হাসিমুখে সম্মতি দিয়ে বললেন, "বিকেল চারটায় সেদিন আমাকে ঐ কৃষ্ণচূড়ার তলে পেলেই তো হয়েছে। আর কি? কিন্তু আপনি মিছ্ করবেন না।"

প্রফেসর সাহেব বললেন, "I shall be there at just four, my dear. I shall come only for your love, ভাষায় ঝরল তাঁর যেমন বাহাদুরি তেমনি দক্ষতা ও চাতুর্য।

গীতিকা গর্বিতা ও বিগলিতা। তিনি সাগ্রহে জানতে চেয়ে বললেন, "আমি তো ভুলেই গেছি। আপনি কোন্ সাবজেক্টে প্রফেসরি করেন?"

প্রফেসর সাহেবের অন্তরে বিচলিত হবার কোন জড়তা নেই। উপরন্তু কত যে গর্ব তাঁর মনে। তিনি গাম্ভীর্য দেখিয়ে উত্তরে বললেন, "ইংরেজিতে।"

"কোন কলেজে? চান্দিনা সরকারী কলেজে নাকি অন্য কোন কলেজে?"

"চান্দিনা মহিলা কলেজে।"

"এটা কি সরকারী না বেসরকারী?"

প্রফেসর সাহেব বিচক্ষণের মত উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, "যদি বলি বেসরকারী। তাহলে কি কেটে পড়বেন? নাকি ঘৃণা করবেন?"

গীতিকা কথা বাড়িয়ে দুঃখ দিতে চাইলেন না তাঁর প্রিয়তমকে। কারণ বেসরকারী হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ এমনিতে নিজেদেরকে বেচারা জ্ঞান করে থাকেন। এই অভিযোগ নিয়ে সরকারের সাথেও অনেক সময় তাঁদের বিবাদ বেঁধে থাকে। তাঁরা একই কোর্স নিয়ে শিক্ষকতা করেন। অথচ বেতনের ক্ষেত্রে সরকারী হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের চেয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্ব কত যে খাটো ও লজ্জাকর।

গীতিকা নরম স্বরে বললেন, "আমাকে আপনার সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন। বিশেষ কোন মুহূর্তে যোগাযোগ করার দরকার হতে পারে।"

প্রফেসর সাহেব চটপট বললেন, "ঠিকানা দিতে পারি। কিন্তু ভুলেও কলেজের ঠিকানায় চিঠি দেবেন না। আমি অন্য ঠিকানা দেব।"

গীতিকা কিছুটা বিস্মিত হলেন এবং দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি প্রিয়তমের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে নিলেন কিছুক্ষণ। তিনি কি যেন বলতে চান, কিন্তু দ্বিধাবোধ হচ্ছে।

প্রফেসর সাহেব হেসে বললেন, "আপনি হয়তো মেজাজী নন, কিন্তু অত্যন্ত ইম্প্রেসিভ। অমন করে চাইছেন কেন?"

"চাইছি না। আপনি আমাকে অবাক করলেন। যে কলেজে চাকুরী করেন তার ঠিকানা চিঠিতে লিখতে পারব না কেন?"

"আপনি সত্যিই মেয়ে মানুষ। এমনিতে দেখছেন, আমি ব্যাচেলর। তার উপর চাকুরী করি একটি মহিলা কলেজে। আপনি জানেন? যদি ইংরেজীতে কোন মহিলা প্রভাষিকা পাওয়া যেত এম. এ. পাস, তবে আমার মত পুরুষ শিক্ষককে নেওয়া হত না। মহিলা না পাওয়ায় কলেজ আমাকে নিতে বাধ্য হয়েছে। নইলে ইংরেজী শিক্ষকের অভাবে পুরো কলেজ বিকল হয়ে পড়ত। অবিবাহিত পুরুষ হিসাবে কলেজের বাউণ্ডারীতে ভেবে-চিন্তে পা ফেলতে হয়। আপনি এতকিছু সহজে বুঝবেন না।"

গীতিকা এবার প্রশান্ত। তাঁর অন্তরের সুখস্বপ্নের শাখায় শুধু নতুন নতুন মুকুল ফুটছে! তিনি নির্দ্বিধায় ভাবতে লাগলেন যে, এ মহাপুরুষ সত্যিই তাঁর জন্য উপযুক্তের চেয়েও বেশী। বুকের ধন, জীবনের অহঙ্কার। তাঁর অসঙ্কোচ মনোভাব মহানন্দের।

গীতিকা সাগ্রহে বললেন, "আমার আগামী সপ্তাহের যত প্রোগ্রাম আছে সেগুলির কোনটা হোক আর নাই হোক, আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার প্রোগ্রামকে অবশ্যই ঠিক রাখব। পাছে আপনি ভুলে যাবেন না। আপনার ঠিকানাটা কিন্তু বললেন না।"

প্রফেসর সাহেব ঢিলামির সুরে বললেন, "এখন থাক। আবার এলে ঠিকানা লিখে দেব।"

"কত হাঁটবেন আর? পা আমার ব্যথা করছে হাঁটতে হাঁটতে। আর পারছি না। চলুন, জায়গা খুঁজে নিয়ে কোথাও বসি।" গীতিকা অন্তরের অবসাদ নয়, দেহের অবসন্নতা দেখিয়ে কোথাও বসার প্রস্তাব করলেন।

ঘাসের উপর বসলে পরনের কাপড়ে দাগ লেগে যেতে পারে। তাছাড়া মাটিও কেমন স্যাঁতস্যাঁতে। সুতরাং উভয়ে পায়ের চামড়ার স্যাণ্ডেল খুলে নিয়ে বসার উপকরণ করে নিয়ে বসে পড়লেন।

গীতিকা বললেন, "আজ তো আছেন ঢাকায়। কাল কি চলে যাবেন?" কথার ভঙ্গিতে তাঁর বেঁধে রাখার সাধ। অর্থাৎ তাঁর মনোভাব এই যে সম্পর্ক যেন ছিন্ন না হয়।

প্রফেসর সাহেব কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। হঠাৎ মুখটি ভার করে নিয়ে তিনি বললেন, "বুঝি আমি চলে গেলেই আপনি খুশী হন?"

গীতিকা উদাসীনার মত উত্তর দিয়ে বললেন, "যদি তেমনটি মনে করেন তবে তাই। কিন্তু পুরো একটি সপ্তাহ পথ চেয়ে থাকতে আমার কষ্টই হবে।"

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। চাওয়া-পাওয়া এবং মুচকি হাসিতে আসর জমে উঠল। গীতিকা জানতে চেয়ে বললেন, "কাল কখন চান্দিনায় চলে যাচ্ছেন?"

"সকাল আটটায়।" প্রফেসর সাহেব ক্ষণিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "দেখুন, আমার ফুফু এবং তাঁর পরিবারের কেউ যেন আমাদের এই সম্পর্কের গন্ধ না পান।"

"কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, তাঁরা তো জানতে পারবেনই আমাদের এই সম্পর্কের কথা।" গীতিকা একগাল হাসি হাসলেন।

"সম্পর্ককে বিবাহবন্ধনে পরিণত না করে জানতে দেওয়া যাবে না। এটা আমার অনুরোধ।" প্রফেসর সাহেবের ভাষায় বেশ মিনতির সুর।

"আপনি চিন্তা করবেন না। আমি কোন কচি খুকী নই যে আপনাকে অপদস্ত করব। আমার প্রেমকে কাদামাখা করব। এবার উঠুন তাহলে।" গীতিকা নিজেই আগে উঠে পড়লেন। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। উভয়ে কথা কইতে কইতে পার্ক থেকে বের হয়ে পড়লেন। ব্যস্ত শহরের কেউ কি জানে, এঁদের চলার পথ একদিন মিলনবাসরে এসে মিলিত হবে কিনা?

তিন

চারদিকে সকাল থেকেই গরম আবহাওয়ার একটা দুঃসহতার ভাব বিরাজ করছে। আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। বাতাস বন্ধ হয়ে পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলছে। যেন এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার আগাম ইঙ্গিত।

প্রফেসর সাহেব একটু আগে রওয়ানা হয়ে চলে গেছেন চান্দিনায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা গীতিকার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে ইঙ্গিতে বিদায়ব্যথা জানায়ে এবং আগামীর সঙ্গসুখের হাসি দেখিয়ে চলে গেছেন তিনি।

গীতিকা শর্ত মতে ঐ শাড়িটি পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। ডুকরে কেঁদে ব্যথা জানানোর ইচ্ছা করছিল তাঁর।

গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে যখন ক্ষণিক পর তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্নতা ভেঙে গেল, তখন টবের ফুলগাছগুলির দিকে চোখ পড়ল। কণ্ঠ ছেড়ে তিনি ডাকতে লাগলেন, "রেশমা, এ্যয় রেশমা?"

রেশমা উপুর খেয়ে পড়ে দৌড়ে এল। দূরে থাকতেই সে সাড়া দিয়ে বলল, "কি জন্য, বড় আপা?"

"এ গাছগুলিতে কতদিন ধরে পানি দিস্ না?"

"কেন কাল সকালে আপনার সামনে তো পানি দিলাম। আজ এখনও দেইনি। দেব এখন। আপনি নাশতা খেয়ে নিন। আসেন।" রেশমা দোষ ঢাকার উপায় খুঁজতে লাগল। যেহেতু গাছগুলিতে পানি দেওয়ার কথা ছিল আরও আগে।

গীতিকা একটু রাগ দেখিয়ে বললেন, "পানি দিতে এত দেরী হল কেন? এ রকম ভুল আর কখনও করবি না। বুঝলি? আগে গাছগুলিতে পানি দে।" অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চান যে, সংসার তদারকি করে বেড়াচ্ছেন। তিনি নাশতা খেতে চলে গেলেন। রেশমা ঠোঁটে কামড় দিয়ে দিয়ে হাসল।

রেশমা টবের গাছগুলিতে পানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করতে লাগল। প্রথম বালতি পানি গাছগুলিতে সিঞ্চন করে রেশমা দ্বিতীয় বালতি পানি আনতে গেল।

একটি তরুণ গায়ে কমদামী একটি চেক কাপড়ের হাফশার্ট, পরনে অল্প দামের একটি স্যুট এবং পায়ে চামড়ার একজোড়া স্যাণ্ডল্ পরে দোতলার দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ল বারান্দায়। কিছুটা লম্বা গড়ন তরুণের। মাঝারি রকমের স্বাস্থ্য তার। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সে। তরুণ সাড়া দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

রেশমা বালতিতে পানি পুরে নিয়ে বারান্দায় আসতেই চিনতে পারল তরুণকে। সে গীতিকাকে ডেকে বলল, "বড় আপা, আজ যে ড্রাইভারের আসার কথা ছিল, সে এসেছে।"

গীতিকা নাশতা খেতে বসেছেন মাত্র। এখনও খাওয়া শুরু করেননি। নাশতা রেখে এলেন তিনি। তরুণ গীতিকাকে দেখে আদবের সাথে সালাম জানিয়ে বিনীত হয়ে দাঁড়াল।

তরুণ বলল, "আপা, আপনি নাকি একজন কার ড্রাইভার চেয়েছেন, আহম্মদ রেস্টুর‍্যান্টের মালিক ওয়াকিল আহম্মদ সাহেবের কাছে। তিনি আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর পরিচিত।"

রেশমা বলল, "বড় আপা, ওদিকে টেবিলে নাশতা জুড়িয়ে যাবে। নাশতা জুড়িয়ে গেলে পাছে আমাকে বকবেন।"

গীতিকা তরুণকে বললেন, "তুমি ড্রয়িং রুমে একটু বস। আমি নাশতাটা খেয়ে আসি।" তিনি যেতে ইতস্ততঃ করে ভদ্রতার খাতিরে তরুণকে জিজ্ঞেস করলেন, "নাশতা খেয়েছ তুমি?"

তরুণ সত্যিই নাশতা খায়নি। দুটি শিঙ্গারা খেয়ে সে রাত কাটিয়েছে। ভাত খাওয়ার সামর্থ ছিল না। এখন সকালে নাশতা খাবে কি করে? কিন্তু এত বেলায়ও নাশতা না খাওয়ার উক্তি করলে কোন কর্মী লোকের নয়, অপদার্থের পরিচয় দেওয়া হয়। তাই তরুণ মিথ্যা বলল, "জী, আমি নাশতা খেয়েই এলাম আপনার কাছে।"

গীতিকা রেশমাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "একে ড্রোয়িং রুমে বসাও।" তিনি চলে গেলেন নাশতা খেতে।

রেশমা তরুণকে একটি চেয়ারে বসাল। সে হেসে বলল, "আপনি আপাকে মিথ্যা বলেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি। সত্য কথা বলুন তো, আপনি নাশতা খেয়েছেন?"

তরুণ গভীরভাবে লজ্জাবোধ করল। তার সমস্ত অন্তরের অভাব-অভিযোগ কান্না হয়ে উথলে উঠতে চাইল। সত্য স্বীকার করে নিয়ে সে মুখ ভার করল।

রেশমা বলল, "আচ্ছা আমি বড় আপাকে কয়ে নাশতা এনে দিচ্ছি। আপনি খেয়ে নিন। লজ্জা কিসের? আমরা কাজ করে খাই। এমনি খাই না। বড় আপা একটু মেজাজী, কিন্তু বিনা দোষে তিনি রাগ করেন না। অন্তরে তাঁর খুব দয়া। দেখবেন, আপনার চাকুরী হয়ে যাবে।" রেশমা সত্যি তরুণের মুখের শুষ্কতা দেখে তার দুঃখ বুঝতে পেরেছিল। সে মুহূর্তের মধ্যে তরুণের সমব্যথী হয়ে উঠল।

রেশমা গীতিকাকে কয়ে এবং তাঁর সদয় অনুমতি নিয়ে নাশতা এনে দিল তরুণকে। তরুণের খিধা মিটল। যেন পুরো এক সপ্তাহ পর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটল তার। সে নীরব ভাষায় অজস্রবার দোওয়া করল রেশমাকে।

গীতিকা নাশতা খাওয়া সেরে এলেন। তরুণ ভদ্রতা দেখাবার জন্য গীতিকাকে দেখে দাঁড়াল, যদিও দুজনে সমবয়সী।

গীতিকা চেয়ারে বসে বললেন, "তোমাকে কি আহম্মদ সাহেব পাঠালেন? তিনি কি তোমাকে ভালভাবে চেনেন?"

"জী হাঁ। তিনিই পাঠালেন। তিনি আমার নিকটাত্মীয়। আমার এক প্রকার মামা। বাড়ি একই গ্রামে– পাশাপাশি।"

"কোথায় তোমার বাড়ি?"

"গ্রামের নাম সত্যপুর। কুমিল্লার চান্দিনা শহরের নিকটে।"

চান্দিনা নামটি শুনে গীতিকা প্রত্যাশিতভাবে খুশী হয়ে উঠলেন। আগ্রহের সাথে বললেন, "চান্দিনা শহর থেকে কতদূরে তোমার বাড়ি?"

"বেশী দূরে নয়। আধা মাইল হবে দক্ষিণে।"

গীতিকা গভীরভাবে নীরবে ক্ষণিক কি যেন চিন্তা করে নিলেন। এই তরুণ যে তাঁর বিভিন্ন কাজে সহায়ক হবে, এটা তিনি বুঝতে পারলেন। এবার তিনি ইন্টারভিউ নেওয়ার মত প্রশ্নপর্ব শুরু করলেন। তিনি জানতে চেয়ে বললেন, "তোমার নাম কি?"

"নুরুল হাসানাত নুরু।"

"বাবার নাম?"

"হামিদ হাসানাত।"

"পড়াশুনা করেছ?"

"করেছি। আই.এ. দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছি।"

"তারপর পড়াশুনা করলে না কেন?"

নুরু খুব গম্ভীর ভাবমূর্তি নিয়ে বলল, "অভাবের সংসার, আপা, বাবা মারা গেছেন অনেক আগে। একটি ছোট ভাই ও ছোট বোন আছে। জমাজমি আছে অল্প। সংসারের আয় বলতে তেমন কিছু নেই। আমার রোজগারেই সংসার চলে। ছোট ভাই-বোন দুটিও কলেজে পড়ে। আমার রোজগারই একমাত্র অবলম্বন। তাই আমি লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিই।"

গীতিকা আরও কিছু শুনতে চাইলেন। কিন্তু নুরু বিনা বাধায় থামল। সে কেমন যেন স্বল্পভাষী। কথায় সে বড় মিতব্যয়ী।

গীতিকা বললেন, "কতদিন ধরে ড্রাইভারি কর তুমি?"

"প্রায় পাঁচ বছর ধরে।"

"আগে কোথায় ড্রাইভারি করতে?"

"বিভিন্ন গাড়িতে ড্রাইভারি করেছি। ট্যাম্পুও চালিয়েছি মাঝে-মধ্যে। আহম্মদ সাহেবের কার চালিয়েছি প্রায় ছয় মাস। তাঁরা কার বিক্রয় করে মটরসাইকেল কেনায় আজ সপ্তাহ যাবৎ আমি বেকার রয়েছি।"

গীতিকা এবার চাকুরীর শর্তগুলি বিশ্লেষণ করে বলতে লাগলেন, "প্রথমত তোমার একটি বায়োডাটা আমাকে দিতে হবে। তার সাথে দিতে হবে তোমার ফটো। দ্বিতীয়ত গাড়ি চালানোর ব্যস্ততা খুব কম। আমি ড্রাইভার রাখি ঠিক, কিন্তু তাকে আরও কতকগুলি সাংসারিক কাজ করতে হয়। কলেজ থাকলে আমাকে ঠিক পৌনে দশটায় প্রতিদিন সেখানে পৌঁছে দিতে হবে। দশটায় আমার ক্লাস। তারপর গাড়ি নিয়ে এসে আমার ছোট বোন গীতালিকে ভার্সিটিতে দিয়ে আসতে হবে। প্রতিদিন সকাল আটটার আগে বাজার করে এনে দিয়ে নাশতা খেতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কলেজ-ভার্সিটিতে গিয়ে আমাদেরকে গাড়িতে করে বাসায় আনতে হবে। তৃতীয়ত গাড়ি পরিষ্কার করা, ভবনের সামনের বাগানের পরিচর্যা করা, বাজার করে দেওয়া, মাসের প্রথম সপ্তাহে ভাড়াটেদের নিকট হতে ভাড়া উত্তোলন করা, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানির বিল অফিসে গিয়ে দিয়ে আসা তোমার কাজ। প্রতিদিন কাজে আসতে হবে সকাল সাতটায়। থাকার জন্য নিকটে কোন ম্যাস দেখে নিতে হবে। বেতন পাবে মাসিক আড়াই হাজার টাকা। সকালে নাশতা এবং দুপুরে ও রাত্রে ভাত আমার বাসাতেই খাবে।"

গীতিকা চাকুরীর শর্ত ব্যাখ্যা করে আড়চোখে নুরুর মুখের দিকে একবার চেয়ে নিলেন এবং চুপ করে বসে রইলেন। নুরু কি বলে তা শোনার জন্য।

নুরু কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, "ম্যাডাম, আমি গরীব। কাজে ফাঁকি পাবেন না। দয়া করে মাসিক বেতন তিন হাজার করে দেবেন।" কিন্তু তার চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ।

গীতিকা মৃদু হাসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ছেলেটি সৎসাহসী, অকপট ও কর্মঠ। তিনি পূর্বের শর্তে অটল থেকে বললেন, "কি রাজি? এত দায়িত্ব পালন করে মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতনে পোষাবে তোমার?"

নুরু বুঝতে পারল, গীতিকা তিন হাজার টাকা বেতন দেবেন না। তাই সে অকপটে উত্তর দিল, "আচ্ছা পোষাবে।" সে চাকুরীতে যোগদানের অনুমতির অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েই রইল।

গীতিকা একটি হাসি দিয়ে বললেন, "আচ্ছা যাও, কাল থেকে কাজে যোগদান কর। বেতন তিন হাজার পাবে। কিন্তু তোমার হয়ে আহম্মদ সাহেব সিকিউরিটির দায় নিতে রাজি হবেন?"

"সিকিউরিটির জন্য আমি তো নগদ কোন টাকা জমা দিতে পারব না, ম্যাডাম। আমি যে গরীব।"

গীতিকা হেসে বললেন, "আরে টাকা নয়, দায়িত্বের নিশ্চয়তা। টাকা দিতে পারবে না, তাতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তিনি তোমার দায়িত্ববোধ ও সততার কতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারবেন? প্রায় চার লক্ষ টাকার একটি নতুন গাড়ি সবসময় তোমার দায়িত্বে থাকবে। আর প্রতিদিন দুই-চার হাজার টাকার কাজ তোমার হাতের মাধ্যমে করানো হবে। আমি অবশ্যই সিকিউরিটি চাই।"

নুরু বিচলিত হয়ে অধঃমুখে অশ্রুভরা চোখে দাঁড়িয়েই রইল।

অবশেষে গীতিকা বললেন, "যদি পার, তুমি গিয়ে আহম্মদ সাহেবকে এক্ষণে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাঁর সাথে একটু আলাপ করে দেখি। তাঁকে আনতে পারবে?"

নুরু তড়িঘড়ি করে দোতলা থেকে নেমে ছুটল আহম্মদ রেস্টুর‍্যান্টে। অনেক তোষামোদ করায় আহম্মদ সাহেব এলেন গীতিকার কাছে।

গীতিকা আহম্মদ সাহেবকে বললেন, "চাচাজী, আমি আপনাকে বাবার মতই জানি। আপনি ছেলেটাকে পাঠিয়েছেন, মনে হয় তাকে দিয়ে কাজ চলবে। কিন্তু আমি তাকে কতটুকু বিশ্বাস করতে পারি?"

আহম্মদ সাহেব বললেন, "অবিশ্বাস বা সন্দেহের কিছু নেই। সে আমার প্রতিবেশী। শিক্ষিত ছেলে। বেকার ঘুরছে সে। উপকার করতে পারলে করুন। অন্যায় সে করবে না। যত টাকা দিয়ে কাজে লাগাবেন, সে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। আমি তো আছি।"

গীতিকা নুরুকে ড্রাইভার নিয়োগ দিতে রাজি হলেন। আহম্মদ সাহেবও বার বার অনুরোধ করে চলে গেলেন। নুরুর চাকুরী হল।

পরের দিন নুরু কাজে এল। গীতিকা বললেন, "আজ দুদিন ধরে কারটি চালানো হয়নি। বডীতে ধূলিবালি আছে, পরিষ্কার কর। তারপর রেশমাকে জিজ্ঞেস কর, কোন কাজ করতে হবে।" অর্থাৎ বাকি দিনের জন্য নুরুর কাজ কি, তা গীতিকা বলতে পারেন না। রেশমাই সেটা ভাল জানে। রেশমা এ বাড়ির মাননীয়া পরিচালিকা। ইংরেজীতে যাকে বলে ডিরেক্ট্রিক্স্!

চার

আজ পুরো এক সপ্তাহের যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষার পর প্রত্যাশিত বৃহস্পতিবার। কলেজ থেকে এসে দুপুরের ভাত খেয়ে গীতিকা প্রফেসর সাহেবের সেদিনকার পছন্দ করা হাল্কা সুনীল শাড়িটি পরে প্রস্তুত হলেন রমনাপার্কে প্রেমিকারূপে বিলাসী মনোরঞ্জনে যাওয়ার জন্য। নুরুকে দিয়ে গতকাল তিনি শাড়িটি লন্ড্রী থেকে ইস্ত্রি করিয়ে এনেছিলেন। ঈষৎ খয়েরী রঙের একটি ব্লাউজ গায়ে দিলেন। ব্লাউজের কাপড়টি যেমন পাতলা তেমনি মিহি ও ছলছলে। তিনি বোতাম এঁটে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছেন, ব্লাউজের